সঙ্ঘাধ্যক্ষ-পরম্পরায় গুরুভাব

প্রব্রাজিকা আপ্তকামপ্রাণা

যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ যে-অহেতুক প্রেমে দেহধারণ করেছিলেন, সেই প্রেম তিনি রেখে গিয়েছিলেন তাঁর শক্তি শ্রীমা সারদা দেবী আর পার্ষদ-পরিকরদের মধ্যে। তাঁরা প্রত্যেকেই নিজেদের জীবনে সেই লোকোত্তর প্রেমের পূর্ণ পরিণতি দেখিয়ে গিয়েছেন। প্রেমের প্রকাশ দানে। স্বামী বিবেকানন্দ নির্দেশ করেছেন চার প্রকার দান—অন্নদান, প্রাণদান, বিদ্যাদান ও জ্ঞানদান। শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদদের জীবনে এই প্রতিটি প্রকারের দানই বিরল না হলেও, অধ্যাত্মজগতের মহাপুরুষদের যোগ্যপথে স্বামীজীর শেষোক্ত দান—পরাজ্ঞান দানই প্রকট হয়ে তাঁদের 'ভূরিদাঃ' করে তুলেছে। এই জ্ঞানদান ঘটেছে বিভিন্নভাবে—কখনও সামান্য কথায়, কখনও গভীর উপদেশে, স্পর্শে বা মন্ত্রদীক্ষা দানের মাধ্যমে।

এই ধারাই চলেছে পার্ষদগণের পরবর্তী সময়ে তাঁদের শিষ্যবৃন্দের ক্ষেত্রেও। বিশেষত যাঁরা সঙ্ঘের অধ্যক্ষপদে বৃত হয়েছেন তাঁদের জীবনে গুরুভাবের মহনীয় প্রকাশ সকলকে মুগ্ধ করেছে। সঙ্ঘজীবনে এঁরা প্রত্যেকেই অনন্য—দধীচির মতো তিলে তিলে জীবন দিয়েছেন সঙ্ঘরূপী শ্রীরামকৃষ্ণের সেবায়। একইসঙ্গে প্রস্তুত হয়েছেন তাঁর হাতের যন্ত্ররূপে—নিজের 'আমি'কে সরিয়ে স্থাপন করেছেন 'বড় আমি'কে। এই অবস্থাকেই 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ' মহাগ্রন্থে স্বামী সারদানন্দজী 'ভাবমুখে থাকা' বলে ব্যাখ্যা করেছেন। আমরা ক্রমশ দেখব, রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সব অধ্যক্ষের জীবনই এই শ্লাঘনীয় পর্যায়টির দ্বারা মণ্ডিত হয়েছে। রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের প্রকৃত গুরু শ্রীরামকৃষ্ণই। তিনি 'ইষ্ট'—কাঙ্ক্ষিততম। সঙ্ঘে তিনিই 'শ্রীগুরুমহারাজ'। পরম্পরাক্রমে ব্যক্তিগুরুরা সকলে তাঁরই প্রতিনিধি। স্বামী ভূতেশানন্দজীর কথা প্রসঙ্গত উদ্ধৃত করা যায় : ''শ্রীরামকৃষ্ণের সমস্ত পার্ষদ শ্রীরামকৃষ্ণকেই একাধারে গুরু ও ইষ্টরূপে নির্দেশ করতেন। এই অনুসারে শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘে কেউই নিজেকে গুরু বলে মনে করেন না। সবাই শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনধারার ধারক এবং বাহক মাত্র।''

এঁরা প্রত্যেকেই সঙ্ঘগুরু, দীক্ষাগুরু এবং লোকগুরুরূপে ইতিহাসে বিশেষ স্থানের অধিকারী। ব্যাবহারিক ও আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে সাধুভক্ত-নির্বিশেষে বহুজন তাঁদের উপদেশ ও পরামর্শ লাভ করেছেন, স্নেহ-কৃপার স্পর্শ পেয়ে সঞ্জীবিত হয়েছেন, তাঁদের ঈশ্বরপরায়ণ জীবন দেখে অনুপ্রাণিত হয়েছেন। এঁদের জীবনকে সাধারণভাবে উপরিউক্ত তিনটি ভাগে ভাগ করা গেলেও, এই প্রবন্ধে আমরা তাঁদের

'দীক্ষাগুরু' রূপটির প্রতিই মনোনিবেশ করব।

শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ সন্তানদের মধ্যে চারজন সঙ্ঘগুরুর পদে আসীন হয়েছেন—স্বামী ব্রহ্মানন্দজী, শিবানন্দজী, অখণ্ডানন্দজী এবং বিজ্ঞানানন্দজী। এঁদের পর পঞ্চম সঙ্ঘাধ্যক্ষ হন (১৮ মে—২৩ অক্টোবর ১৯৩৮) স্বামীজীর শিষ্য স্বামী শুদ্ধানন্দ। তিনি একাধারে ছিলেন বিদ্বান পণ্ডিত এবং অসাধারণ কর্মযোগী। সহাধ্যক্ষ থাকার সময় থেকেই প্রায় সর্বদা তিনি সদ্‌গ্রন্থ পাঠ বা শ্রবণ করতেন। কোনও জাগতিক আলোচনা তাঁর কাছে আর চলত না। শাস্ত্রালোচনা, পাঠ, ভগবৎস্মরণই হয়ে উঠেছিল তাঁর একমাত্র কাজ। নিজের জীবন দিয়ে নিরন্তর সৎপ্রসঙ্গের মহাশিক্ষা দিয়ে যাচ্ছিলেন। একইসঙ্গে হয়ে উঠেছিলেন সরল শিশুর মতো। দীক্ষাপ্রার্থীর অনুনয় দেখে বলতেন, ''ভেবেছে—আমি প্রেসিডেন্ট।... দেখ বাপু, আমার নিজেরই কিছু হল না।" এত অহংলেশশূন্য, অথচ যত অসুস্থই থাকুন, কোনও দীক্ষার্থীকে বিমুখ করতেন না। যিনি নিশ্চিত জানেন তাঁর 'কিছু হল না' তিনি অকাতরে মন্ত্রদীক্ষা দেন কী করে? এ সম্ভব হতে পারে একমাত্র তাঁর পক্ষেই, যিনি স্থিরনিশ্চয় যে তিনি দীক্ষা দিচ্ছেন না—তাঁর শরীর অবলম্বন করে শ্রীরামকৃষ্ণই সব কাজ করছেন।

শিষ্যস্থানীয় এক ভক্তকে শুদ্ধানন্দজী একবার চিঠিতে লিখেছিলেন : ''ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করি তিনি তোমার দেহমন ভেঙে চুরে নূতন করে গড়ে দিন। তুমিও ঠাকুরের কাছে আমার জন্য প্রার্থনা কর, যেন তাঁতে তন্ময় হয়ে যাই...। আমার স্নেহাশীর্বাদ, প্রেমালিঙ্গন ও জীবনে মরণে অনন্ত অনন্ত ভালবাসা জানিবে।" এত নিরভিমান সহমর্মী লোকশুভাকাঙ্ক্ষী মানুষটি কী বিশাল অন্তর নিয়ে গুরুর আসনে বসেছিলেন তা অনুমান করাও অসাধ্য। তাঁর শেষ অসুখের সময় দীক্ষার্থিনী এক অন্ধ মহিলাকে সেবকরা ফিরিয়ে দেন। শরীর-ত্যাগের মাত্র তিন দিন আগে সেই বঞ্চিতার কথা মহারাজ শুনেছিলেন অত্যন্ত সমবেদনার সঙ্গে। করুণায় সকলকে কৃপাবিতরণের জন্য যিনি উন্মুখ, তাঁর হৃদয় আর্তের ভার লাঘব করতে না পারার বেদনায় কতখানি ভারাক্রান্ত হয়েছিল তার পরিমাপ কে করবে?

পরবর্তী অধ্যক্ষ (ডিসেম্বর ১৯৩৮—৩০মে ১৯৫১) স্বামী বিরজানন্দজী—'তপস্যা ও কর্মের একটি মাধুর্যময় সমন্বয়' যাঁর মধ্যে দেখে মুগ্ধ হয়েছে জগৎ। স্বামী গম্ভীরানন্দজী 'History of the Ramakrishna Math and Mission' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, তাঁর অধ্যক্ষতার সময়টি ভারত তথা সমগ্র বিশ্বে রাজনৈতিক-সামাজিক-অর্থনৈতিক ক্রান্তিকাল। সেই ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সময়ে পূজনীয় মহারাজ তাঁর প্রসন্নাত্মা স্থিতধী ব্যক্তিত্ব দিয়ে যেভাবে সঙ্ঘের অধিনায়কত্ব করেছেন, তা গম্ভীরানন্দজীর কলমে 'a blessing for the organisation' বলে বর্ণিত হয়েছে। একইসঙ্গে ধর্মগুরুরূপে হাজার হাজার মানুষের জীবনতরীর কাণ্ডারি হয়েছেন তিনি। নিজের বার্ধক্য ও রোগযন্ত্রণা উপেক্ষা করে, অনেকসময় সামান্য বিশ্রামটুকুও না নিয়ে নানাভাবে অধ্যাত্মজিজ্ঞাসু, ভক্ত, আর্ত, সংশয়ক্লিষ্ট মানুষের প্রয়োজন মিটিয়েছেন। এই সবকিছুই করেছেন মনে 'গুরু'র অভিমানের লেশমাত্র না রেখে। বলতেন, ''আসল গুরু সচ্চিদানন্দ। তিনি অন্তরে রয়েছেন।... তিনি শুদ্ধবুদ্ধিরূপে প্রকাশিত হয়ে সাধককে যখন যেটি দরকার করিয়ে নেন।... গুরুর এই আসল স্বরূপ সর্বদাই শিষ্যের মধ্যে আছেন।"

বিরজানন্দজীর যখন শরীর অসুস্থ, রোজই একশো এক বা দুই ডিগ্রি জ্বর আসে, তখন এক সেবক তাঁকে রোজ পাঁচ-ছয় ঘণ্টা দীক্ষা দিতে বসতে দেখে অনুযোগ করে বলেন, একসঙ্গে অনেককে দীক্ষা দিলে হয়তো তাঁর কষ্ট কিছু লাঘব

হতে পারে। একথা শুনে মহারাজ হেসে উত্তর দেন : ''ঠাকুর এই শরীরটাকে দিয়ে যাকে এবং যে-কজনকে যেটুকু কৃপা করবেন—তা তো আমাকে করতেই হবে রে বাপু! Then why should I be in hurry?''

দীক্ষাদানের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর প্রয়োজনীয় উপদেশ-নির্দেশপূর্ণ পত্রাবলি কত নরনারীকে সংসার-অরণ্যে পথ দেখিয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। স্নেহ-করুণার সঙ্গে তেজ-শক্তির মিলনে অপূর্ব গুরুভাবে লেখা তাঁর একটি চিঠি : ''বীর হওয়া চাই—সংসারকে তুচ্ছ জ্ঞান করা চাই। আমি বড় দুর্বল, আমি কিছু করতে পারব না, তুমি করে দাও এসব ভাব ত্যাগ করতে না পারলে কোনওকালেই কিছু হবে না। উপদেশ তো তোমায় যথেষ্ট দেওয়া হয়েছে। সেভাবে যদি পালন করতে না পার তো কেউ তোমায় কিছু করিয়ে দিতে পারবে না। তোমায় যেসব পত্র দিয়েছি, তা বারবার পড়বে ও সেইমতো চলতে চেষ্টা করবে।'' প্রকৃত জিজ্ঞাসুকে অন্তরঙ্গ উপদেশ : ''প্রাণভরে খুব তাঁকে ডেকে যাও, তাঁকে অন্তরে অন্তরে রেখে তাঁর প্রেমময় রূপের ধ্যানে মগ্ন হয়ে থাকো। সংসারের সুখ দুঃখ মায়া মমতা তুচ্ছ করে তাঁর প্রতি টান অনুরাগ যাতে দিন দিন বৃদ্ধি হয় তাই করবে, তাহলেই পরম সুখ শান্তি আনন্দ পাবে। এই জন্মেই তাঁকে লাভ করে ধন্য হবে, জন্ম-মৃত্যুর পারে যাবে।''

আবার 'মর্কট বৈরাগ্য'কে সহজেই চিহ্নিত করে কশাঘাত করেছেন : ''তুমি যেসব আধ্যাত্মিক প্রসঙ্গের অবতারণা করেছ ও-সকলের সময় এখন তোমার নয়। আগে খাওয়া পরার ব্যবস্থা করো...। খালি পেটে ধর্ম হয় না।''

শ্রেয়ঃপথের যথার্থ যাত্রীর কাছে তিনি যেমন পরম সুহৃদ ও পথনির্দেশক, তেমনি সংশয়ীর কাছেও সত্যদর্শয়িতা। পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্কতীর্থ একদিন মহারাজকে প্রশ্ন করেছিলেন, শাস্ত্রে পঠিত ত্যাগ-তপস্যার ব্যাবহারিক তাৎপর্য কোথায়। মহারাজ দুটি কথায় উত্তর দিলেন : ''ত্যাগ আর কী? বিষয়াসক্তি ত্যাগ। আর তপস্যা? সংসারে একমাত্র ভগবানকেই আপন জেনে, শুধু তাঁকেই ভালবাসা, এই-ই তো তপস্যা।'' তর্কপ্রবণ চিত্তে আবার প্রশ্ন উঠল : ''যাঁকে দেখা যায় না, তাঁকে ভালবাসব কেমন করে?'' সিংহের হৃদয়ে যেন আঘাত লাগল! মহারাজ রক্তিম আননে বিদ্যুদ্‌বর্ষী নয়নে বজ্রকণ্ঠে বলে উঠলেন : ''কে বললে তাঁকে দেখতে পাওয়া যায় না? এই যে—এই তো—এই এখানেই...।'' বলতে বলতে তিনি স্থির নিস্পন্দ হয়ে গেলেন। সেই নিশ্চল তদ্‌গত প্রেমগম্ভীর মূর্তি দেখে পণ্ডিতমশাইয়ের সকল সংশয় ছিন্ন হল।

রোগশয্যাগত গুরুর সঙ্গে কথা বলতে না পেরে জনৈক শিষ্য চিঠিতে আক্ষেপ জানালে মহারাজ তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে উত্তর দেন : ''কথা কওয়াটাকেই আমি মস্ত ব্যাপার বলে মানি না। জানবে, তোমরা দূরেই থাক আর নিকটেই থাক, আমার দীক্ষিত প্রত্যেক সন্তানের জন্য আমি ঠাকুর মায়ের চরণে প্রার্থনা জানাই—তাদের শুভ চিন্তা করি। তুমি মনে কোন খেদ বা দুঃখ রেখো না।''

শিষ্যহিতধ্যানে নিমগ্ন চিরন্তন সদ্‌গুরু-সত্তা!

সপ্তম অধ্যক্ষ (১৯ জুন ১৯৫১—১৩ জানুয়ারি ১৯৬২) স্বামী শংকরানন্দজী মহারাজ। অতিগম্ভীর আপাতকঠোর মানুষ, ভাব-ভক্তি-আবেগের উচ্ছ্বাস তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি কোনওদিন। দীক্ষা প্রসঙ্গে বলতেন, ''কে বা কার গুরু, কে-ই বা শিষ্য? সচ্চিদানন্দই গুরু, আমি সকলকে ঠাকুরের পায়ে সঁপে দিই।'' প্রথম প্রথম দীক্ষার বিষয়ে তাঁর খুব বাছবিচার দেখা যেত, ক্রমশ সেই ভাব চলে গিয়ে প্রবল করুণা তাঁর অন্তর অধিকার করে। শিষ্য একটু বেশিক্ষণ প্রণাম করলে যিনি হেঁকে বলতেন ''ঘুমিয়ে পড়লে নাকি?''—তিনিই করুণার্দ্রচিত্তে

অশক্ত শরীরেও অকাতরে দীক্ষা দিতেন, শরণাগতকে অভয় দিতেন। এক ভক্তের মা অসুস্থ, শয্যাশায়ী কিন্তু দীক্ষা নিতে ইচ্ছুক। ভক্তটি মহারাজকে সেকথা জানালে তিনি বললেন, ''দীক্ষা আবার কী! ঠাকুর-মা-স্বামীজীর বই পড়লেই হল। যাও, রোজ বই পড়তে বলো।'' মা রোজ বই পড়েন, দীক্ষা হল না ভেবে কষ্ট পান। মহারাজকে একই কথা বারবার বলতে ভক্তেরও ভয় হয়। কয়েকদিন পর ভক্তটি মঠে ছুটে এলেন—মা মৃত্যুশয্যায়, বারবার আক্ষেপ করছেন দীক্ষা হল না বলে। সব শুনে মহারাজ চুপ করে রইলেন। ভক্ত ভারাক্রান্ত মনে বাড়ি ফিরে দেখেন মা আনন্দে ভরপুর। বললেন, ''ঠিকমতো পৌঁছে দিয়ে এসেছিস তো?'' ''কাকে?'' ''কেন, মহারাজকে!'' মহারাজ তখন মঠে, কিন্তু সূক্ষ্মশরীরে কলকাতায় গিয়ে মাকে মন্ত্র দিয়ে বলে গিয়েছেন : ''এই তোমার অভয়মন্ত্র। তোমার জন্য কোনও নিয়ম নেই, অসুস্থ শরীর—স্মরণ-মনন করলেই হল।''

আশৈশব রাজা মহারাজের পরিচিত হয়েও এক ভক্ত তাঁর কাছে দীক্ষালাভের সুযোগ পাননি। রাজা মহারাজের মহাসমাধির চার-পাঁচ দিনের মধ্যে তিনি স্বপ্ন দেখেন, মহারাজ তাঁকে বলছেন, ''তোর গুরু কিন্তু অমূল্য (শংকরানন্দজী)।'' হতবাক ভক্ত ভাবলেন, অমূল্য মহারাজ তো দীক্ষা দেন না! যাই হোক, স্বপ্নাদেশ শিরোধার্য করে তিনি প্রায় তিরিশ বছর অপেক্ষা করলেন। শংকরানন্দজী সঙ্ঘগুরু হলে তাঁকে একথা বলাতে আর এক বিপত্তি! তিনি বললেন, ''তোমাকে স্বপ্নে বলেছেন, কিন্তু আমাকে তো কিছু বলেননি!'' তবু শেষপর্যন্ত দীক্ষা হল।

কঠোর বাহ্য আচরণের আড়ালে মহারাজের ছিল একটি স্নেহকোমল মাতৃহৃদয়, যা ভক্ত-শিষ্য-সন্তানদের রক্ষা করত নানাভাবে। স্বল্পকথায় স্পষ্ট উত্তর দিয়ে অধ্যাত্মজিজ্ঞাসুর জটিল প্রশ্নের সমাধান করে দিতেন। হয়তো হঠাৎ ঝড়বৃষ্টি এসেছে, দর্শনার্থীদের লক্ষ করে অসুস্থ মহারাজের কণ্ঠ গমগম করে উঠল : ''কেউ ছাতা আননি?'' মুখে ফুটে 'না'-টি বলারও সাহস নেই কারও। মহারাজ—একটু আগেই যাঁর ঠোঁট নড়ছিল অথচ কথা বেরুচ্ছিল না এত অসুস্থ—তিনি সযত্ন নির্দেশ দিতে লাগলেন কোন দিক দিয়ে কীভাবে যেতে হবে যাতে ভক্তেরা ভিজে না যান। কত আর্তের অনুচ্চারিত প্রশ্নের সমাধান তিনি করে দিয়েছেন কতবার। তাঁর এক শিষ্য খুব প্রাণায়াম করতেন। একবার কাজের খাতিরে বহুদিন ট্রেনে কাটাতে হওয়ায় ট্রেনেই প্রাণায়াম করতে থাকেন। কিছুদিন পর তাঁর কানে এক অদ্ভুত সোঁ সোঁ আওয়াজ শুরু হয় যা কিছুতেই থামে না। একদিন তিনি জয়রামবাটী গেলেন। সেখানে তখন শংকরানন্দজী রয়েছেন। তিনি শিষ্যকে দেখেই পুণ্যিপুকুরে স্নান করে পরদিন তাঁর কাছে যেতে বললেন। পুণ্যিপুকুরে ডুব দেওয়া মাত্র শিষ্যের কানের শব্দ বন্ধ হয়ে গেল। পরদিন মহারাজ তাঁকে বললেন, ''ট্রেনে প্রাণায়াম করেছ কেন?'' উল্লেখ্য, প্রাণায়াম বা শব্দ সংক্রান্ত কোনও কথাই শিষ্য গুরুকে বলেননি।

এইভাবে স্বত উৎসারিত গুরুশক্তির প্রেরণায় মহারাজ শত শত সাধুভক্তদের জীবন নিয়ন্ত্রণ করেছেন। একটি চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন : ''তাঁহার (ভগবানের) কথা তাঁহার শক্তিতে শক্তিমান হইয়া, তাঁহার ইচ্ছানুরূপ কার্য করিয়া তাঁহার ভাবে তন্ময়তা লাভ—ইহাই জীবনের পূর্ণতার সার্থকতা।... তিনি যেমনভাবে চালান, যাহা কিছু করান, তাঁহার ইচ্ছানুযায়ী সেইরূপ শক্তি-সামর্থ্য-সুযোগ সমস্ত দিয়াই করাইয়া লইবেন। সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত ও আনন্দমনে থাকিয়া চলিতে হইবে। উদ্বেগ দুশ্চিন্তার কিছুই নাই।'' মহারাজ নিজে এই অবস্থার জ্বলন্ত নিদর্শন এবং এই-ই ছিল সকলের প্রতি তাঁর উপদেশ।

পরবর্তী অধ্যক্ষ (৬ মার্চ ১৯৬২—১৬ জুন ১৯৬২) স্বামী বিশুদ্ধানন্দ মহারাজ ছিলেন শ্রীশ্রীমায়ের আশ্রিত সন্তান। সঙ্ঘের সহাধ্যক্ষ ও অধ্যক্ষরূপে তিনি হয়ে উঠেছিলেন মায়েরই প্রতিনিধি—সকলের শান্তি-সান্ত্বনার উৎস, ত্যাগে প্রেমে পরিপূর্ণ একটি পরম আশ্রয়স্থল। হাজার হাজার নরনারীকে তিনি অধ্যাত্মপথে চলতে প্রেরণা দিয়েছেন। অত্যন্ত ভক্তবৎসল মহারাজ নিত্য ভক্তসঙ্গে বহুক্ষণ সৎপ্রসঙ্গ করতেন এবং কত আর্ত-জিজ্ঞাসু-ভক্তের জাগতিক ও আধ্যাত্মিক বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করে দিতেন। তাঁর শিক্ষাদানের পদ্ধতি ছিল স্বতন্ত্র। কোনও ভক্ত ঘুমকাতুরে, মহারাজকে কেউ তা বলেনি, তবু ভক্তটি ঘরে ঢুকতেই মহারাজ বলতে লাগলেন : ''কী? খুব ঘুম, না?... এই জগৎটাই তো একটা মস্ত ঘুম। তার ওপরে আবার ঘুম? এই জগদ্রূপ ঘুমটাকে তো কাটাতে হবে। তার ওপরে আরও ঘুমালে হবে কী করে? এখন থেকে চারটের সময় উঠবে।'' গুরুর আদেশে ছিল অমোঘ আশিস, যার বলে ভক্তটি পরিণত বয়সে দিনে আঠারো ঘণ্টা জপ করতেন।

এক ভক্তকে একদিন স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে মহারাজ বলেন পরদিন সকালে সস্ত্রীক মঠে আসতে দীক্ষার জন্য। ভক্তটি জানালেন, তাঁর স্ত্রী অন্তঃসত্ত্বা, দীক্ষা নিতে পারবেন না। শুনে মহারাজের চাহনি, মুখের ভাব বদলে গেল। গম্ভীর কণ্ঠে বলে উঠলেন : ''জান না, আমরা যখন খুশি, যেখানে খুশি, যাকে খুশি, যে-কোনও অবস্থায় মন্ত্র দিতে পারি?'' সাধারণভাবে দীক্ষার স্থানকাল সম্পর্কিত নানান বিধিনিষেধ বৃহৎতন্ত্রসারে পাওয়া যায়। এগুলির পরিপ্রেক্ষিতে মহারাজের উক্তিটি দেখলে বোঝা যায় এঁরা সাধারণ গুরু নন, এঁরা শাস্ত্রোক্ত বিধিনিষেধের ঊর্ধ্বে। অবশ্য রুদ্রযামলের সংশ্লিষ্ট বিধান খুবই উদার—তাতে বলা হয়েছে, যে-ক্ষণে গুরু প্রসন্ন হয়ে দীক্ষাদানের অনুমতি দেবেন সেইক্ষণেই দীক্ষাগ্রহণ চলবে—তা সে যে-স্থান যে-কালই হোক না কেন। মহারাজের আচরণ এই বিধানের অনুসারী।

শাস্ত্র বলেছেন, ''সর্বেভ্যো জয়মিচ্ছেত্তু পুত্রাৎ শিষ্যাৎ পরাজয়ম্''—সকলের কাছে জয়ী হতে চেষ্টা করবে, শুধু পুত্র আর শিষ্যের কাছে পরাজয় আকাঙ্ক্ষা করবে। এই ভাবটি বিশুদ্ধানন্দজীর জীবনে সুপরিস্ফুট হয়েছিল। শিষ্য ও শিষ্যপ্রতিম সন্তানদের উৎসাহ দিয়ে বলতেন : ''আমাদের যা-কিছু হওয়ার তা তো হয়ে গেছে—এখন তোমরা... আমাদের থেকে অনেক বেশি এগিয়ে পড়ো। আমাদের থেকেও কত ভাল সংস্কার নিয়ে এসেছ তোমরা...। আমাদের থেকে আরও অনেক বড় হবে তোমরা।''

গুরু-অভিমানরহিত মহারাজ বলতেন, ''মানুষ যেমন পুষ্পাঞ্জলি দেয় ঠাকুরের পায়ে, আমরা দীক্ষার্থীদের তাঁর (শ্রীরামকৃষ্ণের) পায়ে অঞ্জলি দিই।'' যারা যথার্থ অধ্যাত্মজীবন যাপন করতে ইচ্ছুক তাদের প্রতি মহারাজের কৃপার অন্ত ছিল না। অনবরত তাদের উৎসাহ-অনুপ্রেরণা দিতেন, নানাভাবে সাহায্য করতেন, এমনকী রোজকার রুটিন পর্যন্ত করে দিতেন। তাঁরই কাছে সাধনের উপদেশ শুনে এক ভক্ত কিছুদিন জপ করে কাটান, এমনকী তাঁর কাছেও আসেননি। মহারাজ সেটি লক্ষ করে তাঁকে ডেকে বুঝিয়ে দেন, চঞ্চলচিত্তে জপের চেয়ে সাধুসঙ্গ শ্রেয়, কারণ জপের সময় মন যায় নানাদিকে, কিন্তু সাধুসঙ্গের সময় মনে অন্য কোনও চিন্তার উদয় হয় না।

অপূর্ব এই গুরুভাব, যেখানে গুরু স্বয়ং চান শিষ্য জপ না করে তাঁর সঙ্গ করুক; কারণ অস্থিরচিত্তে জপ করে সে কী পাবে তা অনিশ্চিত, কিন্তু তাঁর মতো ঈশ্বরজানিত পুরুষের সঙ্গ করলে সে জীবনের পাথেয় পাবেই। মহারাজ ব্যাকুল থাকতেন সবার আধ্যাত্মিক ক্ষুধা মেটাতে। বলতেন, ''আমার কাছে যারা আসে, তারা আমার কাছ থেকে

কিছু নিয়ে যায়, কিছু gain করে। তুমি কিছু নিয়ে যাচ্ছ তো?" সকলে তাঁর কাছ থেকে অধ্যাত্মসম্পদ লুটেপুটে নিক—এই ছিল তাঁর করুণার্দ্র গুরুহৃদয়ের একমাত্র আকাঙ্ক্ষা।

নবম অধ্যক্ষ (৪ আগস্ট ১৯৬২—৬ অক্টোবর ১৯৬৫) স্বামী মাধবানন্দ মহারাজের বৈশিষ্ট্য ছিল অসাধারণ পাণ্ডিত্য, আদর্শনিষ্ঠা ও কঠোর নীতিপরায়ণতার সঙ্গে শিশুর সারল্য, নিরভিমানিতা এবং সহানুভূতি। এইসব পরস্পরবিরোধী ভাবগুলির সুসমঞ্জস বিন্যাসেই মাধবানন্দ-চরিত্র সঙ্ঘের ইতিহাসে একটি স্বতন্ত্র স্থান অধিকার করে আছে। আজীবন তিনি গম্ভীর, মিতবাক, আপাতকঠিন। কিন্তু দীক্ষাগুরুর পদে আসীন হয়ে শ্রীশ্রীমায়ের আশ্রিত এই সন্তান যেন সাক্ষাৎ 'মা' হয়ে যান। মন্ত্রদীক্ষাদানে কখনই তাঁর কার্পণ্য দেখা যায়নি। করুণার তরঙ্গ যেন ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল তাঁর সমস্ত গাম্ভীর্য, কঠোরতা। বলতেন, "মা যদি বেছে-টেছে কৃপা করতেন তাহলে কি আমি তাঁর কৃপা পেতাম? ওসব বাছবিচারে আমি নেই। মায়ের দেখানো পথেই আমি চলব।"

জনৈক নিজের কলঙ্কময় জীবনের কথা উল্লেখ করে মহারাজের কৃপা প্রার্থনা করলে, মহারাজকে সেবক জিজ্ঞাসা করেন ইন্টারভিউ-এর জন্য তাঁকে আসতে লিখবেন কি না। তাতে মহারাজের করুণামাখা উত্তর ছিল: "মা তো আমাকে ইন্টারভিউ নিয়ে কৃপা করেননি, তুমি ওকে দিন (দীক্ষাগ্রহণের) ঠিক করে আসতে লিখে দাও।"

শ্রীরামকৃষ্ণই গুরু, তিনি যন্ত্রমাত্র—এটি প্রাণে প্রাণে অনুভব করে মহারাজ ব্যাখ্যা দিতেন এই বলে: "তোমরা কেউ মন্দিরে কাজ কর, বাগানে কাজ কর, রান্নাঘরে কাজ কর। আমিও কাজ করি দীক্ষা দিয়ে। এর বেশি কিছু নয়।" আরও বলতেন, মনে রাখতে হবে সচ্চিদানন্দই আসল গুরু। আবেদন-নিবেদন যা কিছু তাঁর কাছেই করতে হয়।" "শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং বক্তা, আমি তো কেবল লাউড স্পিকার।" অবশ্য সেজন্য তাঁর দীক্ষিত শিষ্যদের যথাযোগ্য উপদেশ দিতে কখনও কুণ্ঠিত হননি। জপধ্যান করে আশানুরূপ ফল না পেয়ে হতাশ এক শিষ্যকে উৎসাহ দিয়ে লিখেছিলেন: "তুমি দুধের বাটিটি হাতে নিয়েই কি শরীরের strength বুঝতে পার? অনেকদিন দুধ খেতে হয়, খেয়ে হজম করতে হয়, তারপরে আস্তে আস্তে তার পুষ্টি উপলব্ধি করা যায়। তোমাদের এই তরুণ বয়স—এই তো সবেমাত্র শুরু। ধৈর্য ধরে নিষ্ঠার সঙ্গে চলতে থাক। হতাশ হবার কিছু নেই।"

মনের চঞ্চলতায় দিশেহারা অপর এক শিষ্যকে মহারাজ লেখেন: "মন স্থির হউক বা না হউক তুমি নিয়মিত জপধ্যানে বসিতে ছাড়িবে না। এইরূপ করিতে করিতে মন ধীরে ধীরে বশে আসিবে। কোন বিরুদ্ধ চিন্তা অর্থাৎ পবিত্র চিন্তা করা উচিত, যেমন ঠাকুরের নিষ্পাপ জীবনের চিন্তা করা। নিজের মনকে যথেচ্ছ বিচরণ করিতে দেওয়া বুদ্ধিমানের কার্য নহে। বরং সাবধানে তাহার মোড় ফিরাইয়া লওয়া উচিত।..."

ভক্তশিষ্যদের সাহস দিয়ে মহারাজ বলতেন, "নিজেকে কখনও ছোট বা দুর্বল মনে করো না। ছোট ছেলের আবদার করার মতো তাঁকেই সব জানাও।... ভগবানকে আশ্রয় করে থাকলে তলিয়ে যায় না। একদিন না একদিন দর্শন লাভ করে জন্ম-মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পাবে।"

প্রচলিত গুরুবাদ যাতে শিষ্যদের অলস আর পরমুখাপেক্ষী করে না তোলে, সেজন্য সচেতন করে দিয়ে মহারাজ বলতেন: "সবই যদি গুরু করেন, তবে তোমার মাথা আর দুটো হাত কী জন্য রয়েছে? তোমার ভবিষ্যৎ তোমাকেই গড়তে হবে। ইচ্ছা করলে তুমি অসম্ভবকেও সম্ভব করতে পার। নিজের দায়িত্ব নিজে নাও।"

একবার দীক্ষাদানের পর সদ্যোদীক্ষিত সন্তানদের উদ্দেশে গুরুগম্ভীর কণ্ঠে আশীর্বাদ জানিয়েছিলেন : ''তোমরা ভাগ্যবান। কত লোক আছে। কিন্তু কে আর ভগবানকে ডাকতে চায়? মন্ত্র যেন শিকলের মতো। কুয়োর অনেক নিচে জল আছে। যত ভগবানকে ডাকবে, নাম করবে, তত জল উপরে উঠবে। তোমাদের কিছু হচ্ছে এটা যেন বুঝতে পারি। যেমন, জলে অনেক মাছ আছে। সেগুলি মাঝে মাঝে জলের উপরে উঠে তুবড়ি মারে। সেরকম তোমাদের কিছু হয়েছে, তা যেন দেখতে পাওয়া যায়। তোমাদের হয়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করব—তোমাদের যেন ভগবান লাভ হয়।''

একইসঙ্গে গুরুর হৃদয় মন্থন-করা আশীর্বাদ, শুভকামনা, আদেশ, কল্যাণপ্রার্থনা... আরও কত কিছু! অধ্যাত্মপথের পথিকের কাছে চিরকালীন প্রেরণার শাশ্বত উৎস।

দশম অধ্যক্ষ (২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৬—১৩ মার্চ ১৯৮৫) স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ—যিনি প্রভু মহারাজ নামেই বেশি পরিচিত—উনিশ বছর ধরে মহাসঙ্ঘের সুযোগ্য অধিনায়কের পদ অলংকৃত করেছিলেন। যে-অনির্বাণ অগ্নিশিখা তাঁর অন্তরকে আলোকময় করেছিল, তার পরশমণি সকলের প্রাণে ছুঁইয়ে দিতে তিনি ছিলেন অক্লান্ত। কাগজে-কলমে তাঁর দীক্ষিতের সংখ্যা পঁচাত্তর হাজারেরও বেশি; আর এর বাইরেও বহু মানুষ আছেন যাঁরা সেই অধ্যাত্ম-বটবৃক্ষের ছায়ায় আশ্রয় পেয়ে ধন্য হয়েছেন।

মহারাজ বলতেন, সঙ্ঘে ঠাকুরই একমাত্র গুরু এবং ইষ্ট। বাকি ব্যক্তিগুরুরা তাঁরই হাতের যন্ত্র। সেই যন্ত্রই নিখুঁত, যে-যন্ত্রের আমি-অভিমান নেই। মহারাজ স্বয়ং ছিলেন এরকম অভিমানবিহীন যন্ত্র—যে-যন্ত্র জরাজীর্ণ হয়েও যুবকের আবেগ-আশা-উদ্যমে পূর্ণ, অপরের কল্যাণের জন্য প্রাণোচ্ছল আগ্রহে অস্থির। ছোট্ট শরীরটি ধারণ করে রেখেছিল যে-বিশাল ব্যক্তিত্বকে, সেটি যেন করুণা দিয়ে গড়া। শাসন, নির্দেশনা, পথপ্রদর্শন, পরিচালন—সঙ্ঘগুরু হয়ে এই প্রতিটিই তিনি করতেন এক অনুপম মাতৃহৃদয় নিয়ে। আপামর জনগণের দৈহিক, আর্থিক, সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য বহুপ্রকারে তাঁর আপ্রাণ প্রয়াস আজ ইতিহাস। সাধারণ মানুষ, বিশেষত নিপীড়িত অবহেলিত মানুষ, উপজাতি এবং নারীদের প্রতি তাঁর সহানুভূতি কিংবদন্তির পর্যায়ে পৌঁছেছে।

দীক্ষাগুরুরূপে তিনি ছিলেন অত্যন্ত উদার। একবার আদিবাসী-অধ্যুষিত একটি মিশন কেন্দ্রে গিয়ে তিনি একশোজনকে দীক্ষা দেন যাদের মধ্যে অধিকাংশই ছিল আদিবাসী ছাত্র। তিনি আধ্যাত্মিক অনুশীলনের সঙ্গে সঙ্গে তাদের নিজস্ব খাদ্যাভ্যাস ও অন্যান্য অভ্যাস বজায় রাখতেই নির্দেশ দেন। অপর একটি আশ্রমে, বিশুদ্ধানন্দজীর কাছে দীক্ষাপ্রাপ্ত এক উপজাতি মহিলা তাঁর কাছে দ্বিতীয়বার দীক্ষালাভের ইচ্ছা জানান। সরল পাহাড়ি মহিলাটির যুক্তি ছিল—দীক্ষা যখন একটি ভাল জিনিস তখন সেটি বেশি করে নেব না কেন? মহারাজ একথা শুনে তাঁকে পূর্বলব্ধ মন্ত্রেই আবার দীক্ষা দেন। একবার একটি আট বছরের বালক মহারাজের থেকে দীক্ষা নিতে চাইলে মহারাজ তাকে পরদিন সকালে দেখা করতে বলেন। সেদিন তার এক ভাইও কান্নাকাটি করতে থাকে যে সে দাদার মতো একই জিনিস চায়। বলা বাহুল্য সেও জানত না 'দীক্ষা' জিনিসটি খায়, না মাথায় দেয়। যাই হোক, দুই ভাইকেই মহারাজ দীক্ষা দেন।

অন্যত্র একবার দীক্ষা দেওয়ার সময় একটি শিশুকন্যার কান্না শুনতে পেয়ে মহারাজ কারণ জিজ্ঞাসা করে জানতে পারেন যে সে দীক্ষার জন্য কাঁদছে। মহারাজ তাকেও দীক্ষা দেন। একটি ছাত্র স্বপ্নে মন্ত্র পায় এবং স্থানীয় আশ্রমে এসে মহারাজের

ছবি দেখে সাধুদের জানায়, এইরকম রোগা, ছোট চেহারার এক মহারাজের কাছে সে স্বপ্নে দীক্ষা লাভ করেছে। বেলুড় মঠে তাকে পাঠানো হলে মহারাজ তাকে আনুষ্ঠানিক দীক্ষা দান করেন।

জলপাইগুড়ি আশ্রমে মহারাজ দীক্ষা দেওয়ার সময় সেবক দেখেন তালিকাভুক্ত দীক্ষার্থীর সংখ্যার চেয়ে একজন বেশি উপস্থিত হয়েছেন। সন্ধানে দেখা গেল, জলপাইগুড়ির রানিমার পিছনে বডিগার্ড মহিলা বসে আছেন, যিনি তালিকাভুক্ত নন। তিনি বললেন, রানিমাকে কখনই একা ছাড়বেন না। সব শুনে মহারাজ তাঁকেও একসঙ্গে দীক্ষা দিলেন।

মহারাজ সকলের মনে দৃঢ়ভাবে এই ভাবটি অঙ্কিত করে দিতেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণই সকলের গুরু। একবার একটি কেন্দ্রে মহারাজের সামনে তাঁরই দীক্ষিত এক শিক্ষক একটি গান গাইতে আরম্ভ করেন যার প্রথম পঙ্‌ক্তিটি ছিল : ''গুরু তুমি মোর, তুমি সর্বস্ব আমার।'' মহারাজ তক্ষুনি তাঁকে থামিয়ে দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিষয়ক গান করতে বললেন। তিনি বলতেন, ''নিজ গুরুর প্রতি ভালবাসা, শ্রদ্ধা ও ভক্তি থাকা ভাল এবং প্রয়োজন, কিন্তু এই নিয়ে কোনও দল তৈরি করা মোটেই কাম্য নয়, সেটা গুরুভক্তিও নয়। গুরুনির্দেশিত পথে নীরবে শ্রীরামকৃষ্ণের আদর্শে নিজের জীবনগঠন করাই ঠিক ঠিক গুরুভক্তি।''

শুধু নির্বিচারে দীক্ষা দেওয়াই নয়, শিষ্যদের উপর মহারাজের করুণা বর্ষিত হত বিচিত্র পথে। মঠের এক ব্রহ্মচারী সায়াটিকার ব্যথায় শয্যাশায়ী। একদিন কোনওমতে তিনি মহারাজকে প্রণাম করতে এলে মহারাজ তাঁকে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করেন। সেই রাত থেকেই ব্রহ্মচারী সুস্থ হয়ে উঠলেন এবং পরদিন থেকে মহারাজ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তিনদিন পর মহারাজ সুস্থ হলে সেই ব্রহ্মচারী যখন মহারাজকে প্রণাম করতে এলেন, মহারাজ তাঁকে বললেন, "Always remember that there are other things to be asked from Guru." পরে জানা যায়, ব্রহ্মচারীটি ইতঃপূর্বে মনে মনে ভেবেছিলেন : ''প্রভু মহারাজের দীক্ষা শ্রীশ্রীমায়ের কাছে আর সন্ন্যাস রাজা মহারাজের কাছে—যাঁরা নিজেদের শিষ্যদের দুঃখকষ্ট দূর করে দিতেন। অথচ মহারাজ আমার গুরু হয়েও আমার এই কষ্ট দূর করছেন না!'' শিষ্যের অবুঝ ক্ষোভ-অভিমান দূর করতে তাই গুরুকে শিষ্যের দেহের অসুখ নিজ শরীরে টেনে নিয়ে ভোগ করতে হল!

একবার এক শিষ্যা অমরনাথ দর্শনে যাবেন বলে মহারাজকে জানালে মহারাজ একটুকরো কাগজে কিছু লিখে কাগজটি মুড়ে তাঁকে দেন এবং সবসময় সেটি সঙ্গে রাখতে বলেন। তাঁরা অমরনাথ দর্শনের পর হঠাৎ মত পালটে পূর্বনির্ধারিত পথ বদলে অন্য পথে ফেরেন। পরে জানতে পারেন যে পূর্বনির্দিষ্ট পথে ভয়ংকর প্রাকৃতিক দুর্যোগ হয়েছে; এবং উপলব্ধি করেন মহারাজের দেওয়া রক্ষাকবচই তাঁদের প্রাণরক্ষা করেছে। এই ধরনের বহু ঘটনার উল্লেখ করা যায়।

দীক্ষাগুরুর পদে আসীন থেকেও তাঁর নিরভিমানিতা কেমন ছিল, তা একটি ঘটনার মাধ্যমেই বোঝা যায়। একবার তিনি মূল মন্দিরে ঢোকার সময় একজন দেহাতি মানুষ ঠাকুরকে প্রণাম করতে আসছে দেখে এক ব্রহ্মচারী তাকে সরিয়ে দিতে যান। মহারাজ সেটি দেখে প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ে ব্রহ্মচারীকে নিরস্ত করেন এবং যতক্ষণ মানুষটি প্রণাম করে ততক্ষণ ব্রহ্মচারীকে ধরে রেখে দাঁড়িয়ে থাকেন। তারপর বলেন, ''খবরদার, এমন কাজ কখনও করবে না। সে ঠাকুরকে প্রণাম করছে। ঠাকুরের কাছে রাস্তার এক ভিখিরি আর বেলুড় মঠের প্রেসিডেন্ট, রাজা, বাদশা সকলেই সমান; সকলেই তাঁর সন্তান। সকলেরই ঠাকুরের কাছে সমান অধিকার।''

শ্রীশ্রীমা যেমন আগত-অনাগত সকল সন্তানকে ভালবাসা-আশীর্বাদ জানিয়ে গিয়েছেন, তেমনি মায়ের সন্তান বীরেশ্বরানন্দজীও শরীরত্যাগের কিছুক্ষণ আগে বলেন : ''সবাইকে আমার আশীর্বাদ জানিয়ে দিয়ো।'' সঙ্ঘগুরু তখন সম্পূর্ণ 'ভাবমুখে'—জগদ্‌গুরুর সঙ্গে একাত্ম।

পরবর্তী অধ্যক্ষ (৯ এপ্রিল ১৯৮৫—২৭ ডিসেম্বর ১৯৮৮) স্বামী গম্ভীরানন্দজী মহারাজ একাধারে ছিলেন শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত, গীতোক্ত সন্ন্যাসী, অনলস কর্মী। তাঁকে বলা হত মাধবানন্দজীর দ্বিতীয় সংস্করণ—উভয়ের মধ্যেই চারটি যোগের সুষ্ঠু সমন্বয় ঘটেছিল। বিভিন্ন শাস্ত্রগ্রন্থ প্রণয়ন, সম্পাদনা ও অনুবাদ; শ্রীশ্রীমা, স্বামীজী ও শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদদের প্রামাণ্য জীবনী রচনা; রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের ইতিহাস রচনা তাঁর অক্ষয় কীর্তি। বাইরে থেকে দেখা যেত তাঁর কঠোর গম্ভীর ভাব, কিন্তু ফল্গুনদীর মতো অন্তরে বইত স্নেহ-করুণার ধারা। বিশেষত সঙ্ঘাধ্যক্ষরূপে চার বছর তাঁর কৃপাময় গুরুরূপটি দেখে সকলে মুগ্ধ হয়েছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ-কথিত 'ঝড়ের এঁটো পাতা'র মতো ছিলেন তিনি। স্বভাবগম্ভীর, মিতবাক, সারা জীবন ভক্তসঙ্গ করেননি বললেই চলে—অথচ দীক্ষাগুরুর পদে যখন অধিষ্ঠিত হলেন, শুরু হল অকৃপণ কৃপাবিতরণ। শিষ্যদের মনে মুদ্রিত করে দিতেন এই ভাবটি যে, তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের সত্তাতেই সত্তাবান। এক শিষ্যা একবার আগে মন্দিরে প্রণাম না করে মহারাজকে প্রণাম করতে যান, কারণ নির্দিষ্ট সময় চলে গেলে আর দর্শন হবে না। মহারাজ জানতে পেরে বললেন, ''যাও আগে ঠাকুরকে প্রণাম করে এসো। জানবে তিনিই সব, আমরা কিছু নই।'' একবার রাঁচি আশ্রমে ভক্তেরা কিছুদিন তাঁর পূতসঙ্গ লাভের সুযোগ পান। তিনি মঠে ফিরে এলে জনৈক তাঁর অভাব অনুভব করছেন জেনে মহারাজ বলেন, ''ঠাকুরের সামনে গিয়ে বসবে।''

শাস্ত্রজ্ঞ গুরু চাইতেন শিষ্যেরাও শাস্ত্ররস আস্বাদন করুক, তাই রাঁচি প্রভৃতি আশ্রমে গেলে—যেখানে অবসর পাওয়া যাবে—দর্শনার্থীদের বলে দিতেন, ''তোমরা প্রশ্ন নিয়ে আসবে।'' কোনও কোনও শিষ্যা তাঁর পদতলে বসে শিশুর মতো আবদার করতেন, নানান প্রশ্ন করতেন; আর মহারাজও স্নেহময় পিতার মতো তাঁদের সব কথা শুনতেন, পাঠ নিয়ে আবার নতুন পাঠ দিতেন।

'গম্ভীরাত্মা' মানুষটি কিন্তু শিষ্যভক্তদের কাছে নিজেকে সহজভাবে মেলে ধরতেন। বিদেশে যাওয়ার আগে এক শিষ্যার ''আপনার জন্য কী আনব'' প্রশ্নের তৎক্ষণাৎ উত্তর : ''আনবে ঠাকুরের প্রতি প্রেম।'' একজন সোয়েটার বুনে এনে দিলে সঙ্গে সঙ্গে সেটি পরে শিশুর মতো তার সামনে এসে আনন্দপ্রকাশ : ''বেশ ফিট করেছে, তাই না?''

একবার এক দম্পতি দীক্ষার দিন ভুল করে একদিন পরে এলে সেবক মহারাজ তাঁদেরকে একটি সম্ভাব্য তারিখ জানিয়ে সেদিন আসতে বলে দেন। মহারাজ পরে একথা শুনে সেদিনই তাঁদের মন্দির থেকে ডাকিয়ে আনিয়ে দীক্ষা দেন। এমনকী রিলিফ ক্যাম্পে গিয়েও তিনি দীক্ষা দিয়েছেন।

এক শিষ্যা মহারাজকে প্রণামান্তে সদ্যঃপ্রাপ্ত জপের মালাটি তাঁর চরণে স্পর্শ করালে মহারাজ প্রথমে চমকে উঠে বলেন—''কী করলে?'' তারপরই শান্তকণ্ঠে ব্রহ্মবিদ পুরুষ বলে উঠলেন, ''ঠিক আছে। মালাও পবিত্র, পাও পবিত্র।'' গুরুর ইষ্টময়তার চরম প্রকাশ!

দ্বাদশ অধ্যক্ষ (২৪ জানুয়ারি ১৯৮৯—১০ আগস্ট ১৯৯৮) স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ অসাধারণ পণ্ডিত, অক্লান্ত কর্মী এবং সুদক্ষ প্রশাসক হিসেবে সঙ্ঘে কিংবদন্তি পুরুষ হয়ে আছেন। তবে এই সবকিছু ছাপিয়ে স্থান করে নিয়েছিল তাঁর

অপার্থিব প্রেম ও করুণা। গুরুরূপে অসংখ্য জনের অধ্যাত্মজীবনের দায়িত্ব তিনি গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর দীক্ষিত শিষ্যসংখ্যা এক লক্ষ একুশ হাজারের কিছু বেশি। সঙ্ঘের ঐতিহ্য স্মরণ করিয়ে দিয়ে তিনি শিষ্যদের বলতেন, ''আমরা প্রতিমায় ঈশ্বরত্ব আরোপ করি, পূজা করি আবার বিসর্জন দিই, কারণ প্রতিমা ঈশ্বর নয়। (সেইরকম গুরুর ক্ষেত্রেও।)... সবার গুরু তো একই এবং তিনি ঈশ্বর।... গুরুর শরীর নাশ হলেও তিনি সূক্ষ্মরূপে শিষ্যহৃদয়ে চিরকাল বিদ্যমান থাকবেন।... তাহলে চিরকাল তুমি গুরুকে কাছে পাবে, কখনও হারাবে না।... মানুষ-গুরু মাধ্যম মাত্র। সেটি বুঝতে না পেরে লোকে মানুষ-গুরুকেই সব ভাবে আর পরে হা-হুতাশ করে।''

নিত্যদিনের ব্যাবহারিক জগতেও এ-সম্পর্কে তাঁর মন থাকত অতি সজাগ। তাঁকে একবার জনৈকের প্রসঙ্গে সেবক বলেন, ''আপনিই ওকে দীক্ষা দিয়েছেন।'' সঙ্গে সঙ্গে বাধা দিয়ে মহারাজ বলে ওঠেন—''না, আমি কাউকে দীক্ষা দিই না, ঠাকুর দীক্ষা দিয়েছেন।'' এক শিষ্য একবার তাঁকে বলেন, তাঁকে স্পর্শ করা, তাঁর সঙ্গে কথা বলা তো শ্রীরামকৃষ্ণকে স্পর্শ করা, শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে বার্তালাপেরই নামান্তর—যেহেতু গুরু-ইষ্ট এক! শুনে মহারাজ গভীরদৃষ্টিতে তাকিয়ে উত্তর দেন : ''নিশ্চয়, তবে যদি সেই বিশ্বাস দৃঢ় থাকে।''

সেইসঙ্গে গুরুভাবের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ তাঁকে দীক্ষাপ্রার্থীর ক্ষেত্রে কোনও বিচার করতে দিত না। দীক্ষার জন্য নির্দিষ্ট বয়স না হওয়া, নির্দিষ্ট বই না পড়া ইত্যাদি তাঁর কৃপাবর্ষণের অন্তরায় হত না। একবার ক্যানসার-আক্রান্ত এক মুমূর্ষু রোগীকে তিনি হাসপাতালে গিয়ে দীক্ষা দিয়েছিলেন।

ভক্তশিষ্যদের সঙ্গে মহারাজ নিজে থেকেই খুব অন্তরঙ্গ সম্পর্ক স্থাপন করে নিতেন। ''বেশি আস না কেন? আমারও তো তোমাদের দেখতে ইচ্ছে করে!''—এইধরনের মিষ্টি অনুযোগ তাঁর মুখে প্রায়শঃ শোনা যেত। ভক্তদের নিয়ে সভা আলো করে বসে থাকতেন—কত গভীর গম্ভীর প্রশ্নোত্তর, কত রঙ্গরস! অন্তরের মাতৃসত্তা ফুটে বেরুত মুখের কথায়—''যেন ষষ্ঠীঠাকরুনের মতো বসে আছি।'' নিত্য এক বিশাল সংখ্যক মানুষ তাঁর কাছে উপস্থিত হতেন ঘর-সংসার-স্কুল-কলেজ-অফিস সামলে। কোনও শিষ্য হয়তো অফিস বা স্কুল সেরে আসতে আসতে দর্শনের সময় পার করে ফেলেছেন; মহারাজ শিষ্যের হয়ে সেবককে বোঝাতে লাগলেন : ''আহা এরা কতরকম কাজ করে, কতদিক সামলে একটু সময় বার করে আসে... তুমি ওকে বকছ কেন?'' এই অপূর্ব ভালবাসার বাঁধনে বাঁধা পড়তেন সকলেই। সংসারে ফেলে-রাখা মন আপনিই ঈশ্বরমুখী হয়ে যেত। একইসঙ্গে তিনি ছিলেন আশ্বাসের প্রতিমূর্তি, উৎসাহদানে অদ্বিতীয়।

ত্রয়োদশ অধ্যক্ষ (৭ সেপ্টেম্বর ১৯৯৮—২৫ এপ্রিল ২০০৫) স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী মহারাজ ছিলেন আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্ব। একদিকে চারটি যোগের সমন্বয়ে সুগঠিত তাঁর নিজের জীবন, অপরদিকে বিশ্বের প্রায় পঞ্চাশটিরও বেশি দেশে ঠাকুর-স্বামীজীর ভাবপ্রচার—যার মাধ্যমেই সম্ভবত তাঁর গুরুভাব বেশি প্রকটিত হয়েছিল। মানুষের চিন্তাজগতে শুভ ভাবরাশির জোগান দেওয়া, জাতি তথা বিশ্বের সামাজিক সাংস্কৃতিক আধ্যাত্মিক উন্নতিসাধন এবং এই কর্মপথে নবচেতনার উন্মেষসাধনকে তিনি আনুষ্ঠানিক দীক্ষাদানের চেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতেন। সেজন্যই দীক্ষাদান আরম্ভ করতে অনুরুদ্ধ হয়ে তিনি বলেছিলেন, ''ঠাকুরের নামই তো সারা জীবন প্রচার করছি, এই তো দীক্ষা, আবার কী দীক্ষা দিতে হবে?'' পরে তাঁর মত পরিবর্তিত হয় এবং প্রায় ষাট হাজার মানুষ তাঁর কাছে মন্ত্রদীক্ষা লাভ করেন।

দীক্ষাদানের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অত্যন্ত উদার। সামাজিক পরিস্থিতি বিচার করে এতদিন স্ত্রী বা স্বামী এককভাবে কিংবা একা মেয়ে দীক্ষা প্রার্থনা করলে তেমন প্রশ্রয় পেতেন না। মহারাজ দীক্ষার আবেদনপত্রে এ-ধরনের কঠোরতা বর্জন করেন। ঠাকুর-মা-স্বামীজীর জীবনীর সঙ্গে স্বামীজীর 'পত্রাবলী' এবং 'ভারতে বিবেকানন্দ' বই দুটি তিনি দীক্ষার্থীর অবশ্যপাঠ্য হিসেবে নির্দিষ্ট করেছিলেন, যাতে যুবসমাজ ও ভক্তেরা স্বামীজীর ভাবাদর্শে নবভারত গঠনে উদ্যোগী হতে পারেন। মহারাজ মনে করতেন, অল্পবয়স থেকে শুভ চিন্তা বিশেষ ফলপ্রসূ। তাই যুবসম্প্রদায় তো বটেই, এমনকী বহু শিশু ও কিশোর-কিশোরী মহারাজের কাছে দীক্ষা লাভ করে ধন্য হয়েছে। একবার তিনি হসপিটালের বিছানায় শুয়েই আমেরিকা থেকে আগত এক ভক্তকে দীক্ষা দেন এবং আর কিছু না থাকায় প্রসাদ হিসেবে ইলেকট্রল দেন। তাঁর গুরুহৃদয় এভাবেই যে-কোনও পরিস্থিতিতে মানুষকে কৃপা করতে উন্মুখ হয়ে থাকত। এমনকী পূর্বতন অধ্যক্ষ মহারাজের কাছে দীক্ষাপ্রাপ্ত এক ভক্তকে তার গুরুর দেহান্তের পর শোকাকুল দেখে মহারাজ তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, ''আমিই তোমার গুরু। আমি তো আছি। তুমি আমার কাছে আসবে।'' করুণায় বিগলিত অপরূপ গুরুমূর্তি!

পরবর্তী অধ্যক্ষ (২৫ মে ২০০৫—৪ নভেম্বর ২০০৭) স্বামী গহনানন্দজী মহারাজের বৈশিষ্ট্য ছিল সুনিয়ন্ত্রিত কর্মময় জীবন এবং সংযত সুষম চরিত্র। শান্ত, মৃদুভাষী অথচ প্রবল ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষটি দীক্ষাগুরুর পদে বৃত হওয়ার পর তাঁর মধ্যে কৃপাঘন গুরুরূপটি বিকশিত হয়েছিল। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে বহু দুর্গম প্রত্যন্ত অঞ্চলে গিয়ে তিনি মানুষের আধ্যাত্মিক তৃষ্ণা নিবারণ করেছেন। মঠ ও মিশনের বিভিন্ন কেন্দ্র ছাড়াও বহু প্রাইভেট আশ্রমে—অধিকাংশ ক্ষেত্রে ন্যূনতম প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাও নেই এমন জায়গাতেও থেকে দীক্ষাদান করতেন। হাসপাতালে ভর্তি রোগীকেও তিনি পরিস্থিতির প্রয়োজনে দীক্ষা দিয়েছেন। শরীরে বিভিন্ন ব্যাধির যন্ত্রণা নীরবে সহ্য করে দীক্ষাদানের কর্মসূচি নিয়ে দীর্ঘদিন তাঁর সফর নিয়ে কেউ অনুযোগ করলে বলতেন, ''সঙ্ঘ আমাকে এই কাজটি দিয়েছে, আর এটাই যদি না করি তবে করব কী?'' প্রায় এক লক্ষ তেতাল্লিশ হাজার মানুষকে তিনি কৃপা করেছেন।

দীক্ষা দেওয়ার সময় তিনি স্বামীজীর ভাবাদর্শ, নিজের মুক্তি ও সকলের কল্যাণের কথা জ্বলন্ত ভাষায় ব্যাখ্যা করতেন। শিষ্যদের বলতেন, ''ক্ষুধার সময় খাবার ইচ্ছা, তৃষ্ণা পেলে জলপানের ইচ্ছা, বেঁচে থাকার জন্য শ্বাস-প্রশ্বাসে বাতাস পাওয়ার বলবতী ইচ্ছা যেমন দরকার, ঈশ্বরলাভের জন্য সেরকম বলবতী ইচ্ছা ভীষণ দরকার। আর চাই তাঁকে পাওয়ার জন্য নিষ্ঠার সঙ্গে নিত্য অভ্যাস।''

প্রত্যন্ত অঞ্চলে দীক্ষা দিতে গিয়ে করুণাময় গুরু বহুক্ষণ কাটাতেন। সেবক আপত্তি করলে বলতেন, ''এদের মধ্যে আবার কবে আসব তার কোনও ঠিক নেই। তাই এদের সঙ্গে যতটা সম্ভব সময় কাটিয়ে যাই।'' দীক্ষার্থীর সংখ্যা অনেক সময় দুশো-আড়াইশো হয়ে যেত, অসমর্থদের জন্যও সময় দিতে হত। প্রত্যেককে ধৈর্য ধরে সবকিছু বোঝাতে গিয়ে বিকেল বা সন্ধ্যাও হয়ে যেত। নিজের বয়স বা শরীরের কথা মহারাজ এসময় ভুলে যেতেন। প্রতিবন্ধী বা সংশোধনাগারে বন্দিদেরও মহারাজ দীক্ষাদানে বঞ্চিত করেননি। তাঁর কৃপার প্রভাবে বন্দিদের জীবন পরিবর্তিত হয়েছিল।

অনুন্নত, দরিদ্র মানুষ—বিশেষত আদিবাসীদের প্রতি মহারাজের বিশেষ সহানুভূতি দেখা যেত।

গুরুকৃপা বর্ষিত হত নানাভাবে। তাঁর মুখের একটি-দুটি কথায়, দৃষ্টিতে দীক্ষিত সন্তানদের কত সমস্যার সমাধান করে দিতেন। একটি শিশু তাঁর

কাছে দীক্ষা প্রার্থনা করায় তিনি দীক্ষা দেন এই শর্তে—যতদিন সে নিজে বুঝে উপাসনাপদ্ধতি মেনে জপ করতে না পারবে ততদিন তার মা—যিনি তাঁর কাছেই দীক্ষিতা—কন্যার হয়ে সেটি করে দেবেন। একবার ছত্তিশগড়ের প্রত্যন্ত গ্রামে তাঁর দীক্ষিত এক বৃদ্ধার নিমন্ত্রণে তার বাড়ি গিয়ে তিনি আনন্দ দিয়ে আসেন। আর একবার তাঁর এক শিষ্যদম্পতির একমাত্র পুত্র মারা গেলে মহারাজ তাঁদের সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, তিনিই তাঁদের সন্তান। তিনি তাঁদের সঙ্গে সেভাবেই ব্যবহার করতেন। ধীরে ধীরে তাঁরা সহজ স্বাভাবিক হয়েছিলেন।

একজন মহারাজকে প্রশ্ন করেছিলেন, ''আমি ঠাকুরকে ছোটবেলা থেকে বড় ভালবাসি। দীক্ষা নিলে তো আমার ভালবাসা ভাগ হয়ে যাবে। কারণ গুরুকেও তো আমাকে ভালবাসতে হবে!'' মহারাজ উত্তর দেন : ''তোমাকে ঠাকুরকেই ভালবাসতে হবে। গুরু শুধু পথপ্রদর্শক। ঘটক যেমন স্বামী ও স্ত্রীর মিলন ঘটিয়ে দেয়, সেরকম গুরু ইষ্ট ও শিষ্যের মিলন ঘটিয়ে দেন।'' একদা, ''মহারাজ, এই ছেলেটি আপনার (শিষ্য)'' শুনে মহারাজ বলেছিলেন, ''কেউই আমার নয়, আমরা সবাই ঠাকুরের।'' আর একবার, একজন দুর্ঘটনাগ্রস্ত হয়েছেন শুনে মহারাজ জিজ্ঞাসা করেন, ''সেসময় তোমার ঠাকুরকে মনে পড়েছিল?'' বাইরে কর্মময় এবং অন্তরে রামকৃষ্ণময় এই মহাজীবন সকলের প্রেরণা।

পঞ্চদশ অধ্যক্ষ (ডিসেম্বর ২০০৭—১৮ জুন ২০১৭) স্বামী আত্মস্থানন্দজী মহারাজ দীক্ষাদানের ক্ষেত্রে প্রথম প্রথম কঠোর থাকলেও ক্রমে খুবই উদার হয়ে যান। যথার্থ আন্তরিকতা আছে দেখলে তিনি নয়-দশ বছর বয়সের প্রার্থীকেও কৃপা করেছেন। আদিবাসী সম্প্রদায়ের প্রতি তাঁর বিশেষ সহানুভূতি ছিল। রাঁচি, মুম্বই, আসাম, অরুণাচল প্রদেশ প্রভৃতি স্থানে গিয়ে সেখানকার বহু আদিবাসী মানুষকে তিনি দীক্ষা দিয়েছিলেন। বেশ কিছু প্রতিবন্ধীও তাঁর কাছে আশ্রয় পেয়েছেন। সন্তানের মৃত্যুতে শোকাকুল এক দম্পতিকে দীক্ষা দিয়ে, নানাভাবে সান্ত্বনা দিয়ে তিনি স্বস্থ করেছিলেন। আগরতলায়, ক্যানসার-আক্রান্ত এক রোগী দীক্ষালাভে ইচ্ছুক কিন্তু তাঁর কাছে আসতে অপারগ জেনে, তিনি রোগীর বাড়ি গিয়ে দীক্ষা দেন।

এইভাবে নির্বিশেষে কৃপাবিতরণের কারণটি মহারাজ নিজেই একটি লেখায় ব্যাখ্যা করেছিলেন : ''যিনি সঙ্ঘাধ্যক্ষের আসনে বসবেন, তিনিই হন শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতিনিধি। তিনি করুণায় বিগলিত হয়ে যান। করুণাময় শ্রীরামকৃষ্ণ অবতীর্ণ হয়েছিলেন—মানুষকে রক্ষা করার জন্য, তাদের পথ দেখাবার জন্য, তাদের উদ্ধারের জন্য। এইজন্য যিনিই সঙ্ঘাধ্যক্ষের আসনে বসেন তিনিই শ্রীরামকৃষ্ণকে ধ্যান করতে করতে তাঁরই সত্তাপ্রাপ্ত হয়ে যান।... আমরা অনেক সময় ভুলবশত মনে করি এই মহারাজ বা ওই মহারাজ সঙ্ঘ চালাচ্ছেন। আসলে সঙ্ঘ চালাচ্ছেন... ঠাকুর, মা, স্বামীজী...। তাঁরাই যাঁকে দিয়ে যা করাবার তা করিয়ে নেন।''

মহারাজের নিজের জীবন এই কথারই দৃষ্টান্ত।

বেলুড় মঠ প্রতিষ্ঠার (১৮৯৮) অর্ধশতাব্দীরও বেশিকাল পরে স্বামীজীর স্বপ্নসম্ভব শ্রীসারদা মঠের প্রতিষ্ঠা (১৯৫৪)। মেয়েদের মঠ প্রতিষ্ঠার দায় স্বামীজী তাঁদের ওপর অর্পণ করে গেছেন স্মরণ করে বেলুড় মঠ কর্তৃপক্ষ শ্রীশ্রীমায়ের জন্মশতবর্ষে স্বামীজীর সংকল্প বাস্তবায়িত করেন। এর চার বছর আট মাস পর থেকে শ্রীসারদা মঠ স্বাধীনভাবে কাজ শুরু করে—স্বামীজী-প্রণীত বেলুড় মঠের নিয়মাবলি অনুসারেই। বেলুড় মঠ কর্তৃপক্ষ ততদিন শ্রীসারদা মঠের ব্রহ্মচারিণীদের ব্রহ্মচর্য ও সন্ন্যাস দিয়েছিলেন। স্বাধীন নারীমঠের প্রথম অধ্যক্ষাপদে তাঁরা বরণ করেন শ্রীশ্রীমায়ের শিষ্যা ও অন্তরঙ্গ সেবিকা

প্রব্রাজিকা ভারতীপ্রাণামাতাজীকে—যিনি অতঃপর মন্ত্রদীক্ষা, ব্রহ্মচর্য ও সন্ন্যাস দিতে থাকেন। প্রথম আটজন সন্ন্যাসিনীর মধ্যে তিনি ছাড়া সকলেই ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদদের বা তাঁদের সন্তানদের আশ্রিত। এঁদেরই মধ্যে আরও তিন জন পরবর্তী কালে সারদা মঠের অধ্যক্ষাপদে বৃত হয়েছেন।

কার্যপরিচালনায় স্বতন্ত্র হলেও শ্রীসারদা মঠের আদর্শ, উদ্দেশ্য ও কর্মধারা বেলুড় রামকৃষ্ণ মঠের সঙ্গে অভিন্ন। একই গুরুশক্তি পরম্পরাক্রমে এই দুই মঠে কার্যকরী। একই ভাবাদর্শের দুটি প্রবহমান ধারা এ-দুটি সঙ্ঘ। তাই শ্রীসারদা মঠের অধ্যক্ষা মাতাজীদের গুরুভাব সম্পর্কেও এই প্রবন্ধে কিছু বলার অবকাশ থাকে।

রামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ যেমন শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতিনিধি, শ্রীসারদা মঠের অধ্যক্ষাও তেমনি শ্রীশ্রীমায়ের প্রতিনিধি। প্রথম অধ্যক্ষা (২ ডিসেম্বর ১৯৫৪—৩০ জানুয়ারি ১৯৭৩) প্রব্রাজিকা ভারতীপ্রাণামাতাজী একাধারে ছিলেন গুরু এবং মা। দীক্ষিত সন্তান, ভক্তবৃন্দ, মঠের সাধারণ সম্পাদিকা থেকে শুরু করে নবাগতা ব্রহ্মচারিণী—সকলেই তাঁকে 'মা' বলে সম্বোধন করতেন। সকলের প্রতি তাঁর আচরণও ছিল অনুরূপ।

শুধু আধ্যাত্মিকই নয়, জাগতিক ক্ষেত্রেও শিষ্যদের সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিতেন তিনি, আপন জননীর মতোই। তাদের সব কথা ধৈর্য ধরে শুনতেন, সাংসারিক সমস্যাগুলি সমাধান করে দিতেন সহানুভূতির সঙ্গে। তাঁর আশ্বাসে, আদেশে বা নির্দেশিত সমাধানে এমন কিছু থাকত যা তৎক্ষণাৎ শান্তি দিত; বহির্জগতেও সমস্যাগুলির মীমাংসা এমন অভাবনীয় পথে ঘটত যে বহুক্ষেত্রে যুক্তিবুদ্ধি দিয়ে তার ব্যাখ্যা মিলত না। তাঁর কাছে দীক্ষিত, সঙ্ঘে যোগদানে ইচ্ছুক বহু মেয়েকে তিনি গৃহত্যাগ করতে নানাভাবে সাহায্য করেছেন।

তাঁর মাতৃস্নেহের সঙ্গে কঠোরতা ও নিয়মানুবর্তিতার এক অপূর্ব সংমিশ্রণ ঘটেছিল। তিনি নিজে যেমন স্বামী শংকরানন্দজীর নির্দেশে কাশীর সাতাশ বছরের নীরব সাধনজীবন ছেড়ে মঠে এসেছিলেন, তেমনই সঙ্ঘগুরুরূপে সর্বদাই সকলের দৃষ্টি ফিরিয়ে দিতেন 'সঙ্ঘের আদেশ ঠাকুরেরই আদেশ'—এই আদর্শের দিকে। একইসঙ্গে, সঙ্ঘের আদেশে কোনও মঠবাসিনীকে দূরের কেন্দ্রে যেতে হলে তাঁর মাতৃহৃদয় ব্যথিত হয়ে উঠত।

তাঁর প্রাণঢালা ভালবাসা পেয়ে তাঁর প্রতি সকলের এত আপনবোধ জাগত যে অনেকসময় বাহ্যরীতি অনুসরণ করাও সম্ভব হত না। একবার এক সদ্যোদীক্ষিতা কন্যাকে দুপুরে প্রসাদ পাওয়ার পর ঘরে ডেকে মা জানতে চান মন্ত্র ও উপাসনাপদ্ধতি মনে আছে কি না। কন্যাটি সোজা মায়ের পাশে খাটেই বসে পড়লেন। সেবিকা তাঁকে নিচে নেমে বসতে বললে মা বলে ওঠেন : ''না না, ও বসুক না আমার কাছে।'' সন্তানেরা কিছুদিন না এলেই তিনি ব্যাকুল হতেন, খবর নিতেন। তাঁরা মঠে এসে অল্পসময় থাকলে বলতেন, ''এখুনি এসেই এখুনি যাওয়া—ভাল লাগে না আমার।''

শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত সন্তানদের কল্যাণকামনা করেছেন তিনি। মহাপ্রয়াণের অব্যবহিত আগে তাঁর মুখে একদিকে যেমন শোনা গিয়েছিল 'সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম, অহং ব্রহ্মাস্মি' ইত্যাদি অনুভবী বাক্য, তেমনি সকলকে আপ্লুত করেছিল তাঁর আকুল প্রার্থনা : ''সকলের মঙ্গল হোক, সকলের অবিদ্যা দূর হোক।''

একবার এক শিষ্যা তাঁর চরণে দেওয়ার জন্য আনা পদ্ম তাঁর সামনে এসে আনন্দে উত্তেজনায় ফোটাতে পারছেন না, মা সেটি চেয়ে নিয়ে সুন্দর করে ফুটিয়ে শিষ্যার হাতে দিয়ে বললেন, 'দাও'। গুরুর স্বহস্তে ফোটানো পদ্ম দিয়েই গুরুর চরণপূজা হল। মাতৃময়তায় সম্পৃক্ত গুরুশক্তির কী মাধুর্যময় বিকাশ!

দ্বিতীয় অধ্যক্ষা প্রব্রাজিকা মোক্ষপ্রাণামাতাজী (১০ এপ্রিল ১৯৭৩—৩০ আগস্ট ১৯৯৯) ছাব্বিশ বছর ধরে সঙ্ঘের আধ্যাত্মিক জীবনের গুরুদায়িত্ব বহন করেছেন। অধ্যাত্মজিজ্ঞাসু মাত্রেই তাঁর স্নেহ ও মনোযোগ পেতেন। অগণিত মানুষের জীবনকে তিনি ঈশ্বরমুখী করেছেন, বহু সংশয়ীকে পথের সন্ধান দিয়েছেন, অসংখ্য প্রতিকূল মনকে আপন করে নিয়েছেন। দীক্ষিত সন্তানগণ তাঁকে শুধু গুরুরূপেই পেতেন না, তিনি ছিলেন সাক্ষাৎ মাতৃমূর্তি। বিপুল সংখ্যক ভক্তের কাছে তাঁর স্নেহের আকর্ষণ ছিল দুর্নিবার। মাতাজী আছেন, তিনি আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন—এই ভাবনা থেকেই কত মানুষ ছুটে আসতেন মঠে।

মাতাজীর গুরুভাব তাঁকে করে তুলেছিল অনুগ্রহের মূর্ত বিগ্রহ। একাধিক ক্ষেত্রে অন্তিম রোগশয্যায় শায়িত মানুষকে তিনি বাড়ি গিয়ে দীক্ষা দিয়েছেন। কত প্রার্থীর আগ্রহে পরিবারের প্রতিকূলতা অগ্রাহ্য করে তাকে অধ্যাত্মপথে সাহায্য করেছেন। জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতে টালমাটাল বহু মানুষ তাঁর প্রেরণায় খুঁজে পেয়েছেন বেঁচে থাকার নতুন অর্থ। কত বৈচিত্র্যপূর্ণ পথে তাঁর গুরুকৃপা বর্ষিত হত তার ইয়ত্তা নেই। এজন্য তাঁকে কেউ শ্রদ্ধা-ভালবাসা কৃতজ্ঞতা জানাতে এলে বলতেন, ''আমাকে নয়। আমি তো তাঁর যন্ত্রমাত্র। শ্রীশ্রীমা-ই তোমার জন্য সব করেছেন।''

এই বিশ্বাস প্রতিফলিত হত তাঁর লেখাতেও : ''আমি এখানে বসে আছি—শ্রীশ্রীঠাকুর, মায়ের ইচ্ছায়। যেটুকু মানুষের সেবা করার ভার আমাকে তাঁরা অনুগ্রহ করে দিয়েছেন এবং আমি যে এইটুকু তাঁদের সেবা করে যেতে পারছি, তাঁদের নামে একটু আনন্দ দিতে পারছি, তাতেই আমার জীবন সার্থক।''

এই অপূর্ব আত্মবিলোপ আর শরণাগতিই বোধহয় তাঁর সর্বপ্লাবী গুরুশক্তির মূলমন্ত্র।

পরবর্তী অধ্যক্ষা (১৭ নভেম্বর ১৯৯৯—৩ ফেব্রুয়ারি ২০০৯) প্রব্রাজিকা শ্রদ্ধাপ্রাণামাতাজী। তাঁর সঙ্ঘজীবন অক্লান্ত কর্মময় এবং একইসঙ্গে ঈশ্বরময়। তাঁর চরিত্রের দার্ঢ্য, তেজ এবং আপাতকঠোর ভাবটি সঙ্ঘগুরুপদে আসীন হওয়ার পর থেকে ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হয়ে যায়। ক্রমশ হয়ে গিয়েছিলেন কোমল, ক্ষমাশীল, মা-ময়। ভক্তশিষ্যদের বলতেন, ''মঠে আসবে, মন্দিরে মা অপেক্ষা করছেন।''

তাঁর অন্তরের স্নেহের প্রকাশ বাইরে সবসময় দেখা যেত না। সহজে আধ্যাত্মিক উপদেশ দিতে চাইতেন না। তবে দীক্ষিত সন্তান আন্তরিক জিজ্ঞাসু হলে নিরাশও করতেন না। শিষ্যদের তিনটি কথা মনে রাখতে বলতেন : ক) মা, ঠাকুর আমাদের কাছে সর্বদাই আছেন। খ) মা বলেছেন, কারও দোষ দেখো না এবং গ) নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়া করে অর্থাৎ মানিয়ে নিয়ে থাকতে হবে।

তাঁর ব্যক্তিত্ব, অগাধ পাণ্ডিত্য, সংবেদনশীল মন, সূক্ষ্ম রসবোধ এবং বুদ্ধির দীপ্তি বিশেষ করে তরুণ সম্প্রদায়কে আকৃষ্ট করত। বহু ছাত্র-ছাত্রী তাঁর কাছে দীক্ষাগ্রহণ করে। মোক্ষপ্রাণামাতাজীর দীক্ষিত সন্তানদের প্রতি তিনি ছিলেন বিশেষ মনোযোগী—তাঁরা যাতে গুরুর অভাব বোধ না করেন সেজন্য তাঁর আপ্রাণ চেষ্টা ছিল। ভক্ত ও শিষ্যদের নানাভাবে উৎসাহ ও ভরসা দিতেন : ''জীবনটা শ্রীঠাকুর-মার পায়ে নোঙর তো করেছ। ভয় নেই ভেসে যাবার। বুকের মধ্যে তিনি, কণ্ঠে তাঁর নাম, মহামন্ত্র—এখন ভয় নেই ভাবনা নেই।—হারিয়ে যাব না। তাঁর কোলেই থাকব।'' অভয় ও আশ্বাসে পূর্ণ চিরকল্যাণকামী গুরুশক্তি!

বর্তমান অধ্যক্ষা প্রব্রাজিকা ভক্তিপ্রাণামাতাজীর বৈশিষ্ট্য তাঁর প্রচণ্ড কর্মপর জীবনের অন্তরালে একটি নীরব শরণাগত সাধনজীবন। সঙ্ঘগুরুর পদে

বৃত হওয়ার পর থেকে তাঁর অতি অন্তর্মুখ জীবন সকলকে মুগ্ধ করেছে। তাঁর দুটি-একটি কথা, স্মিতমুখ, সস্নেহ দৃষ্টিই সকলকে শান্তিতে আনন্দে ভরিয়ে দেয়। ''ঝড়ের এঁটো পাতা হয়ে থাকো''—কথামৃতের এই বাক্যটি তাঁর মহামন্ত্র এবং তিনি স্বয়ং এই বাক্যের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। ভক্তশিষ্যেরা উপদেশ প্রার্থনা করলে সংক্ষেপে বলেন, ''মাকে ধরে থাকবে।'' স্বামী বিজ্ঞানানন্দজীর দীক্ষিতা এই কন্যাটির মাধ্যমেই আজ সঙ্ঘে গুরুশক্তি প্রবহমান।

শ্রীরামকৃষ্ণ-করুণাগঙ্গা অবনীর বক্ষ প্লাবিত করে প্রবাহিত হয়ে গিয়েছে। অবতারপুরুষের লীলাবসানের পর তাঁর পার্ষদবৃন্দ, তাঁরা অপ্রকট হওয়ার পর তঁদের সন্তানগণ, আবার তাঁদের শরীররক্ষার পর তাঁদের শিষ্যগণ—এই ধারায় চলেছে করুণাগঙ্গার প্রবাহ। আমরা বসে আছি সেই প্রেমসুরধুনীর তীরে। দেখে যাচ্ছি,

''তরঙ্গ মিলায়ে যায় তরঙ্গ উঠে,
কুসুম ঝরিয়া পড়ে কুসুম ফুটে।''

একের পর এক সঙ্ঘগুরু আসেন, চলে যান। ''তবু অনন্ত জাগে।'' স্বামী প্রেমেশানন্দজীর ভাষায় : ''দুর্গাপ্রতিমা বিসর্জন দেওয়া হয়—আবার আর একখানি প্রতিমা তার জায়গায় বসিয়ে পূজা করা হয়। আমাদেরও এক-একজন সঙ্ঘগুরু চলে যাচ্ছেন—শূন্যস্থানে আবার আমরা নতুন প্রতিমা বসাচ্ছি। এ প্রতিমা ঠাকুরেরই প্রতিমা।'' গঙ্গায় বিসর্জিত প্রতিমা তো গঙ্গাতেই লীন হয়ে থাকে! যে-তরঙ্গ মিলিয়ে গিয়েছে, সে তো নদীতেই মিশে আছে! তাই শ্রীরামকৃষ্ণ-গঙ্গায় মিশে আছেন সকল সঙ্ঘগুরু। এখানে কেউ কোথাও যান না। ''নাহি ক্ষয় নাহি শেষ।'' তাঁদের সঙ্গে তাই আমাদের বিচ্ছেদও ঘটতে পারে না। ধ্যানগম্য হয়ে তাঁরা আমাদের অন্তরের অন্তরতম হয়ে যান। তাঁদের শুভ আশিস, সকরুণ স্নেহ আমাদের অজ্ঞান দূর করে, চোখ খুলে দেয়। আমরা 'হয়ে উঠতে' থাকি। এগিয়ে চলি সেই তুঙ্গলক্ষ্যের অভিমুখে—যেখানে নিত্য উৎসব, নিত্য শ্রী, নিত্য মঙ্গল। ✠

সহায়ক গ্রন্থ

১। স্বামী অজ্ঞজানন্দ, *স্বামীজীর পদপ্রান্তে* (উদ্বোধন কার্যালয় : কলকাতা, ২০১৩)

২। সম্পাদক : স্বামী সর্বদেবানন্দ, লেখক : ডাঃ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী, *স্বামী শঙ্করানন্দ* (উদ্বোধন কার্যালয় : ২০১৩)

৩। প্রব্রাজিকা বিশ্বপ্রাণা, *সাধুসঙ্গে পুণ্যকথা* (শ্রীসারদা মঠ : কলকাতা, ২০১২)

৪। সম্পাদক : স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ, *শতবর্ষের আলোকে স্বামী মাধবানন্দ* (বাগআঁচড়া রামকৃষ্ণ সারদা আশ্রম, ১৪০০)

৫। সম্পাদক : স্বামী চৈতন্যানন্দ, *স্বামী বীরেশ্বরানন্দ : এক দিব্য জীবন* (স্বামী বীরেশ্বরানন্দ স্মৃতি-কমিটি, ২০১৩)

৬। *স্বামী গম্ভীরানন্দ : এক মহাজীবনের কথা* (স্বামী গম্ভীরানন্দ সেন্টিনারি কমিটি, ২০০৮)

৭। সম্পাদক : স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ, *স্বামী ভূতেশানন্দ : শতবার্ষিক শ্রদ্ধাঞ্জলি* (সোমসার শ্রীরামকৃষ্ণ সেবামন্দির, ২০০২)

৮। *স্বামী রঙ্গনাথানন্দ : জীবন ও ব্রত* (স্বামী রঙ্গনাথানন্দ জন্মশতবার্ষিকী উৎসবপালন কমিটি, ২০০৯)

৯। সম্পাদক : স্বামী চৈতন্যানন্দ, *স্বামী গহনানন্দ : এক উৎসর্গীকৃত জীবন* (প্রকাশক পার্থকুমার দাশ, ২০১০)

১০। সম্পাদনা : প্রব্রাজিকা নির্ভয়প্রাণা, *ভারতীপ্রাণা স্মৃতিকথা* (শ্রীসারদা মঠ, ২০১৩)

১১। সম্পাদনা : প্রব্রাজিকা বেদান্তপ্রাণা, *প্রব্রাজিকা মোক্ষপ্রাণা* (শ্রীসারদা মঠ, ১৪০৮)

তথ্যঋণ : স্বামী বিমলাত্মানন্দ, প্রব্রাজিকা বেদান্তপ্রাণা, প্রব্রাজিকা সদানন্দপ্রাণা